মা আনন্দময়ীর আগমনে

শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

মা আনন্দময়ীর আগমনে
প্রকাশক শ্রীশ্রীআনন্দময়ী সংঘ
প্রধান কার্য্যালয় ঃ কনখল, হরিদ্বার-২৪৯৪০৮

দ্বিতীয় প্রকাশঃ শুভ গুরুপূর্ণিমা, জুলাই ২০০৬
সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত
ISBN 81-89558-21-8
মূল্য ঃ ৪০.০০

প্রচ্ছদ অঙ্কণ ঃ শ্রী চিত্তরঞ্জন পাকরাশী
মুদ্রক ঃ ইস্ট ওয়েষ্ট পাবলিকেশন
সি ১৪৮ গ্রেটার কৈলাশ -১
নতুন দিল্লী- ১১০০৪৮

প্রস্তাবনা

শ্রী অরুন প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিত "মা আনন্দময়ীর আগমনে" পুস্তকটির প্রথম সংস্করণ ১৯৪২-সনে- অর্থাৎ প্রায় ৬৫ বছর আগে লক্ষ্ণৌ-এর ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স কর্তৃক প্রকাশিত হয়। শ্রীশ্রী মায়ের আধ্যাত্মিক জীবন ও শ্রীমার ক্রমবিকাশ ও স্ফুরনের ঐ অধ্যায়টিতে লেখক লক্ষ্ণৌতে একটি কলেজে অধ্যাপনার কাজে লিপ্ত ছিলেন। শ্রীশ্রীমা সেই সময়ে প্রায়ই লক্ষ্ণৌ ও বেনারসে আসতেন এবং ভক্তদের সান্নিধ্যে একনাগারে কয়েকদিন বা সপ্তাহ কাটাতেন এবং তাঁদের জীবনের সুখ দুঃখ, ভয় ভীতি, ধর্মজীবনের কর্ত্তব্য ও দায় এবং ঈশ্বর প্রাপ্তির উপায় —প্রভৃতি বিভিন্ন প্রশ্নের, নানা উপমা-সহ, জবাব দিয়ে তাঁদের আধ্যাত্মিক পথে টানবার প্রয়াস করতেন।

১৯৪২ সনে মা যখন লক্ষ্ণৌ-এ এসে গোমতী নদীর তীরে একটি তাঁবুতে অবস্থান করছেন তখন শুধু সাধারণ ভক্তরাই নন, ডঃ রাধাকুমুদ মুখার্জ্জী, ডঃ পান্নালাল আই.সি.এস্ প্রভৃতি বিদ্বজ্জনেরাও মায়ের দরবারে এসে হাজির হতেন। ধর্মপিপাসু, ইতিহাস ও এবং ভারতের আধ্যাত্মিক পরম্পরার অনুরাগী অধ্যাপক বন্দোপাধ্যায় মায়ের স্বরূপটি জানবার ও তাঁর কাছ থেকে আধ্যাত্মিক জ্ঞান প্রাপ্তির আশায় প্রায়ই 'মা'এর দরবারে পৌছে যেতেন। মা'য়ের সাথে যা কথাবার্ত্তা হতো বিভিন্ন বিষয়ে তাঁর প্রশ্ন এবং মা'য়ের জবাব, মাতৃ বানীর অফুরন্ত অমৃতধারা, এবং

মাঝে মায়ের ভাব ও 'লীলা' তাঁর মনে কি প্রতিক্রিয়া ও অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল— সবকিছুই প্রতিদিন তাঁর 'দিনপত্রীতে' (Diary) লিখে রাখতেন। 'মা আনন্দময়ীর আগমনে' পুস্তকটির উৎস ঐ দিনপত্রীতে সযত্নে রক্ষিত তথ্যাবলি ও লেখকের মাতৃরূপ দর্শন ও মাতৃলীলার অনুভূতি ও উপলবদ্ধি।

এই পুস্তকের সবকটি অংশই সুখপাঠ্য। শেষের অংশে লেখকের ভাষায় মন্তব্যে এবং মাতৃস্বরূপের ব্যখ্যায় এটা সুস্পষ্ট যে তিনিও মহাসাধক ভাইজীর মত বিশ্বাস করতেন যে মা আনন্দময়ী ছিলেন নিখিল ব্যাপিকা, বেদপ্রকাশিকা ও স্বয়ং প্রণবরূপিনী।

এই বহু পুরাতন অথচ চিরনুতন এবং মূল্যবান পুস্তকটির একটি নতুন সংস্করণ প্রকাশ করে আমরা শুধু মায়ের সেই বিদগ্ধ ভক্তের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাই নিবেদন করছিনা, শ্রীশ্রী মায়ের চরণেও জানাচ্ছি অজস্র প্রণাম আমাদের এই পুস্তকটি পুনর্মুদ্রনের প্রেরনা জোগানোর জন্য। সবইতো তাঁরই ইচ্ছা।

সুনীল গুহ
আহ্বায়ক
কেন্দ্রীয় প্রকাশন বিভাগ।

শুভ গুরুপূর্ণিমা
কনখল, জুলাই ২০০৬

প্রথম সংস্করণে

লেখকের নিবেদন

যাঁহারা শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীকে লক্ষ্ণৌএ দেখেন নাই বা আবার তাঁর দর্শন পেতে চান তাঁদের তৃপ্তির জন্য আমার ডায়েরীর কয়েকটি ছিন্নপত্র প্রকাশিত হইল। কষ্ট করিয়া বা চেষ্টা করিয়া এখানে কিছুই লেখা হয় নাই। যেমন যেমন ঘটিয়াছে ও তাহা যেরূপভাবে চিত্রপটে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে তাহাই বর্ণিত হইয়াছে। সব কথা যে বলা হইয়াছে বা কোনও কথা যে বাদ নাই, এমনও বলা চলে না। শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ীর কথাগুলি লেখকের অন্তরে যেমন প্রভাব বিস্তার করিয়াছে ঘরে ফিরিয়া সেইভাবেই লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে। শ্রীশ্রীমার কথাগুলি ও তাঁহার বলিবার ভঙ্গিমা, লেখকের সামর্থ অনুযায়ী রক্ষিত হইয়াছে। উদ্দেশ্য তাঁর স্বরূপ ও বাণীকে আরও আপনার করিয়া লওয়া। আশা করি সকল ত্রুটি ও বিচ্যুতি মার্জ্জনীয় হইবে।

পাণ্ডুলিপি হইতে রচনাটিকে উদ্ধার করিয়া পুস্তকের আকার দিবার দায়িত্ব ও ভার লইয়াছেন পুস্তক প্রকাশক ব্যানার্জ্জী ব্রাদার্স। এই পুস্তক বিক্রয় করিয়া যাহা কিছু অর্থ সংগ্রহ হইবে তাহা সমস্তই শ্রীশ্রীমা আনন্দময়ী মহিলা আশ্রমের তহবিলে জমা হইবে।

লক্ষ্ণৌ
মহাষ্টমী, অক্টোবর, ১৯৪২ } শ্রী অরুণ প্রকাশ বন্দ্যোপাধ্যায়

সূচীপত্র

প্রথম ভাগ (দর্শন ও শ্রবন)

বিষয়	পৃষ্ঠা
১ দর্শন	১
২ কথাবার্ত্তা	৫
৩ মাতাজীর দরবার সকালবেলা	২২
৪ মাতাজীর দরবার বৈকালবেলা	৩১
৫ মাতাজীর অদর্শনে	৪১

দ্বিতীয় ভাগ (স্মরণ ও চিন্তন)

১ ধর্ম্মজীবনের দুইটি বিশেষত্ব	৪৭
২ দ্বন্দ্বের সমাধান	৫৪
৩ মন্দির প্রতিষ্ঠা	৬৭
৪ ভক্তি ও যোগ	৭৬
৫ জ্ঞান ও কর্ম্ম	৮৭
৬ আপ-জ্যোতি-রস-অমৃতম্	১০১
৭ ধর্ম্মজীবনে বাধাবিঘ্নের গ্রন্থি খোলা ...	১০৩
৮ একটি অসমাপ্ত কাহিনী	১১২

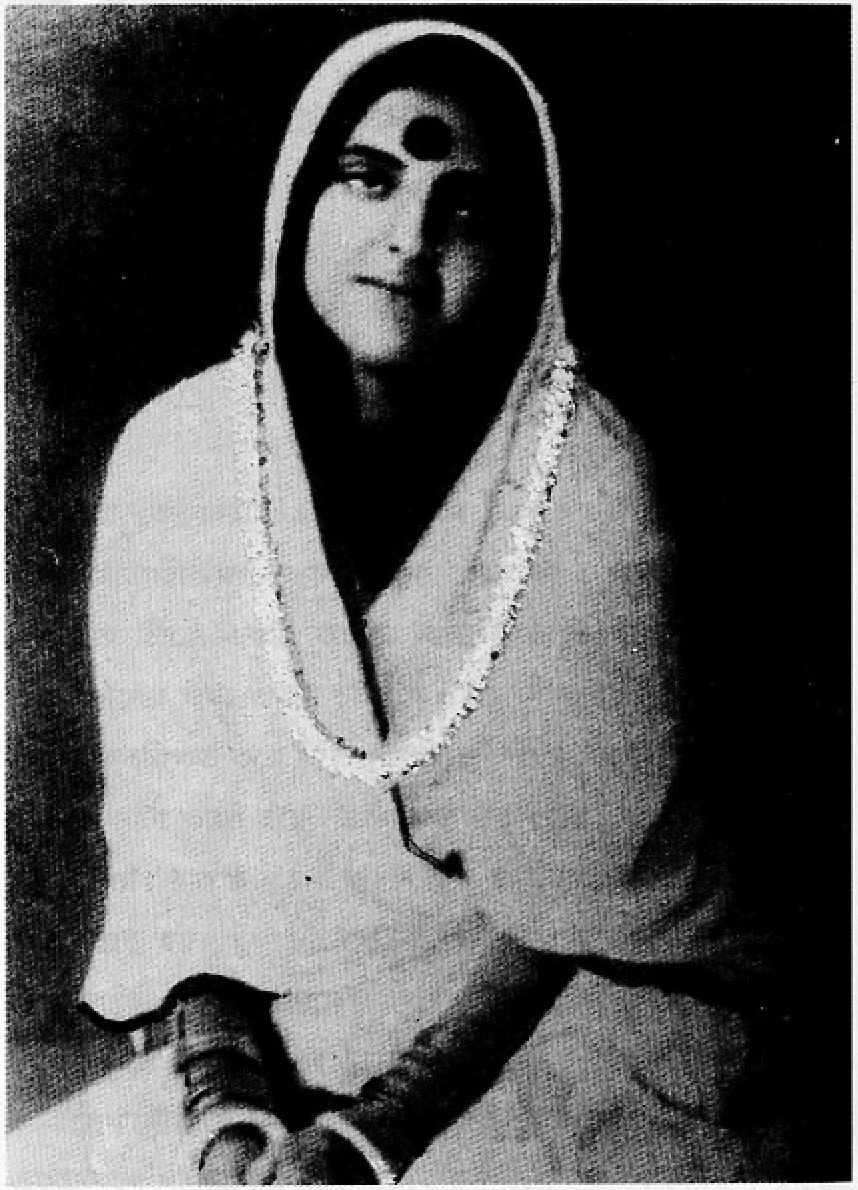

প্রথম ভাগ

(দর্শন ও শ্রবণ)

(১)

দর্শন

২রা ফেব্রুয়ারী ১৯৪২। বৈকাল বেলা। কর্ম্মস্থান থেকে ফিরে এসেই মাতাজীর দর্শন পাবার জন্য বেরুলাম। পেপার মিলের কাছে, গোমতীর তীরে, একটি বাগানে মাতাজী তাঁবুর মধ্যে বাস করছেন শুনে দর্শনের জন্য তথায় চলিলাম। মনে নানাবিধ বিষয়-চিন্তা এসে মনকে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে লাগল। নদীতীরে পথ দিয়ে যেতে যেতে আবার মনটা তাজা হয়ে উঠল। তখনও রৌদ্র বেশ আছে। বাতাস কিন্তু ঠাণ্ডা। রাস্তায় দু'চার জন লোক যাতায়াত করছে। গাড়ীঘোড়া নাই বল্লেই হয়। একখানা মোটর পাশ দিয়ে চলে গেল। আমি যে দিকে যাচ্ছি সেই দিক থেকেই এল। আমার দৃষ্টি সোজাসুজি মাতাজীর স্থানের দিকে। আমি চলেইছি।

সেখানে গিয়ে স্থানটি বেশ ভাল লাগল। কয়েকটি হিন্দুস্থানী ভক্ত একটা বৃহৎ শামিয়ানায় বসে মাতাজীর সম্বন্ধে গল্প করছেন। একটু দূরে একজনকার থাকবার মত একটি ছোট তাঁবু দেখা যাচ্ছে।

মাতাজীর সম্বন্ধে নানা কথা কানে এল। "তিনি ভক্ত নন, স্বয়ং ভগবান" ইত্যাদি। তাঁহারা আদর করে শ্রদ্ধাপূর্ব্বক মাতাজীর সম্বন্ধে যা কিছু মন্তব্য করছিলেন শুনতে আমার ভালই লাগছিল। কে একজন এমেরিকান্ মহিলাকে শ্রী অরবিন্দ নাকি মাতাজীর সহিত সাক্ষাৎ করতে বলেছিলেন। তিনি কত ভক্তিভরে শাড়ী পরে দেখা করতে আসতেন। পাশ্চাত্য দেশের লোকেদের মধ্যে ভক্তি, আমাদের মধ্যে তেমন শ্রদ্ধা নাই কেন? এই কথাবার্ত্তা শুনছিলাম।

আমার মন চঞ্চল হয়ে উঠছিল। জানলাম—মাতাজী মোটরে করে বেরিয়েছেন। বুকের ভিতরটা ঝনাৎ করে উঠল। তবে কি সেই মোটরেই মাতাজী চলে গেছেন? আমার পথেই তো পড়েছিল! উঠে গিয়ে বাগানে একটু বেড়ালাম। বাগানের সঙ্গে নদীর উপর একটি প্রাইভেট ঘাট আছে। সেইখানে কতক্ষণ দাঁড়ালাম। সূর্য্য অস্ত যাবার সময় হোল। পাখীরা নীড়ে ফিরে যাচ্ছে। দু'চারটি করে আরও লোকের ভিড় জমে উঠতে লাগল। ভাবলাম তাঁবুতে গিয়ে বসি।

সেখানে যেতেই একটি যুবক, মাথায় অনেক চুল, আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। শুনলাম, মাতাজীর সঙ্গে তিনি ঘুরে বেড়ান। তিনি আর একটি যুবকের সঙ্গে গল্প করছিলেন। "চারবাক্ প্রত্যক্ষ দর্শনের উপর আস্থা স্থাপন করতেন, ন্যায়শাস্ত্র অনুমানের উপর জোর দিয়েছে। সব ঠিক। এ ছাড়া আরও পথ আছে। Fourth Dimension সম্বন্ধে এখনও ঠিক হোল না। একবার প্রমাণ হলে তখন ত শামিয়ানা থাকতেই এটা ফুঁড়ে ওদিকে গিয়ে বেরুনো যাবে।" ইত্যাদি। আমার মন মাতাজীর দর্শন চিন্তায় নিবিষ্ট। পথের মধ্যে তো দেখা হয়। কিন্তু আমার তো সাধন ভজন কিছু নাই। তাই দেখা হয়েও দেখা হয়না! শুনলাম ঐ

যুবকটি মাতাজীর সম্বন্ধে বাংলায় একখানি পুস্তক লিখেছেন। তাঁর কাছ ঘেঁসে গিয়ে জিজ্ঞাসা করলাম ও বইখানি একটিবার চাইলাম। তখনও একটু আলো ছিল। আলো থাকতে থাকতে একবার চাইলাম। যুবকটি এনে দিলেন। বইখানির উপর যুবকটির নাম শুধু "অভয়" লেখা আছে। পাতা উল্টাতে গিয়া মাতাজীর ছবি চোখে পড়ল। ছবিটা এক মনে দেখতে লাগলাম। খুব ভাল লাগল। ছবিতে প্রথম দর্শন হয়ে গেল। আলো কমে আসছিল। পড়তে আর ইচ্ছা হোল না। যা পেলাম তাই নিয়ে বসে রইলাম।

মোটরের শব্দ কানে এল। সকলে বল্লেন, মাতাজী আসছেন। মনটাকে কুড়িয়ে নিয়ে ফিরে এলাম। গোধূলির শেষ আলোটুকুতে মাতাজী প্রকাশ হলেন। ছবির চেয়ে রোগা লাগল। মাথার চুল খোলা, গায়ে শাল জড়ানো, পরণে শাদা কাপড়। তাঁবুতে তাঁর জন্য একটা বিশেষ আসন পাতা হোল, সেইখানে তাঁকে বসানো হোল। জোশীজী (Retired Inspector of Schools) কিট্সনের একটা বড় আলো এনে যথাস্থানে রাখলেন। বল্লেন "মাতাজী দিয়া জ্বালা হয়েছে।" বলেই দূর থেকে সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করলেন। সন্ধ্যার প্রণামটুকু তিনি একাই সাঙ্গ করলেন না। আমাদের সকলের মাথা নত হোল। যিনি অন্ধকারের পারে, জ্যোতির্ম্ময়, তাঁর উদ্দেশ্যে অজানা পথের কয়েক জন পথিক মাতাজীকে লক্ষ্য করে সেই অসীম দেবতার চরণেই বন্দনা জানালেন।

আমি তাঁবুর একটি পাশে বসেছিলাম। যথেষ্ট শীতবস্ত্র গায়ে ছিল না। মনে করে বেরিয়েছিলাম যে দিনের আলোতেই বাড়ী ফিরতে পারব। তাই নিয়ে যাই নি। অভয় আমাকে বল্লেন, "আপনি আর একটু এগিয়ে এসে বসুন না!" আমি বল্লাম, "শীঘ্র পালাব বলে এক পাশে বসে আছি।" অভয় বল্লেন, "পালাবেন কেন?" আমি বল্লাম, "ঠাণ্ডা

পড়ছে কিনা। দেখ্‌ছেন না, বেশ ঠাণ্ডাবাতাস দিতে আরম্ভ করেছে। আর দু'চার মিনিটের মধ্যেই আমাকে যেতে হবে।" অভয় উচ্চৈঃস্বরে বল্লেন, "মা, ইনি বল্‌ছেন, ঠাণ্ডা লাগবে তাই শীঘ্র পালাবেন।" শ্রীশ্রী মা শুনতে পেয়ে একমুখ হেসে বল্লেন, "হাঁ ঠাণ্ডা হবে, কিন্তু ঠাণ্ডা লাগবে কেন?" আমার প্রতি প্রশ্ন করলেন, "বাবা ঠাণ্ডা লাগে কোথায়? সেখানে কি ঠাণ্ডা গরম কিছু আছে?" তাঁর হাসিটুকু মনকে স্নিগ্ধ করে দিল।

কয়েক জন মালা নিয়ে অগ্রসর হতে লাগল। একটির পর একটি মালা মাতাজীর গলায় শোভা দিতে লাগল। তাঁর কোন পরিবর্ত্তনের লক্ষণ দেখলাম না। সেইরূপ মুখে প্রসন্নতার হাসি লেগেই আছে, মাথাটা একটু পেছনদিকে ঝুঁকে আছে। শরীরটা প্রায় স্থির হয়েই আছে। চোখদুটী সকলের দিকেই। তবে কা'কে দেখছেন বুঝতে পারা গেল না। কিংবা হয়ত নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করে রয়েছেন, তা'ও বোঝা যায় না।

হিন্দুস্থানী মহিলারা তাঁর কাছে ঘনিষ্ঠভাবে বসলেন। আমার খুব ভাল লাগল। একটি মহিলাকে আলাদা দেখে তৃপ্তি হয় না। ভারতবর্ষের সকল মেয়েকে ও তাঁদের সাধনস্বরূপের উদ্দেশ্যে আমি প্রণাম জানালাম। মাতাজীকে আর পৃথক করে প্রণাম করবার কথা মনে এলো না। আমি চুপ করে পাশ কাটিয়ে, তাঁবু থেকে যতদূর সম্ভব সকলের অলক্ষ্যে, চোরের মত প্রস্থান করলাম। অন্তরে রয়ে গেল আমার চোরাই মাল। মায়ের ছবিখানি সেখানে মুদ্রিত হয়ে গেল। মনে হোল, হয়ত এ ছবি কাল প্রভাতে নূতন সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে মিলিয়ে যাবে। কিন্তু তা'ও যদি হয়, এও আমার পক্ষে অনেক নয় কি? ভগবানের দর্শন যাঁরা পান তাঁদের ভিতর দিয়ে ভগবানের উদ্দেশ্যে আমার প্রণাম জানাই, এই

মনে করে সেখানে যত নরনারী বালক বালিকা বসেছিলেন সকলের উদ্দেশ্যে নীরবে প্রণাম জানিয়ে, সেখানকার আলো থেকে আমি বাহিরের অন্ধকারের মধ্যে বেরিয়ে পড়ে দেখলাম আকাশে প্রতিপদের চাঁদ নদীর জলের উপর ঝিক্ ঝিক্ করে ভেসে বেড়াচ্ছে। আমার মনটা কি স্থির না অস্থির? আর কি ঠাণ্ডা লাগবে? কত কথা, কত চিন্তা কত আবেগ, মনের মধ্যে উঠ্‌তে লাগল। আর ঐ ছোট্ট নদী গোমতী যেমন নীরবে বয়ে যাচ্ছে আমিও সেই মত ভেসে চল্লাম, ঘরের পানে।

(২)

কথাবার্ত্তা

পরের দিন। ভোরে উঠে মনে হোল, আর মাতাজীর কাছে যাব না। কি হবে? নিজের দৈন্যের বোঝা নিয়ে চুপ করে নিভৃতে পড়ে থাকাই ভাল। কিন্তু কলেজ থেকে ফিরে এসেই একটা আকর্ষণ অনুভব করলাম। জল খাবার খেয়েই ছুটলাম, সেই নদীর ধারের সেই বাড়ীতে, সেই মাতৃস্বরূপিণী মূর্ত্তির কাছে, যাঁর স্বরূপটি আমার মত অস্থির-প্রকৃতির-মানুষটির অন্তর সারাদিন অলক্ষ্যে ভরেছিল।

গিয়ে দেখি নদীর ধারে ঘাটটিতে এক গাদা লোকের মধ্যে বসে রয়েছেন মাতাজী। লোকগুলি যেন মিলে মিশে ফুলের মালার মত তাঁকে বেষ্টন করে রয়েছে। আকাশে যথেষ্ট রৌদ্র : নদীর জল হাসিমুখে আমাকে অভ্যর্থনা জানাল। আমার সলজ্জভাব সহজেই কেটে গেল। একটু যেন মুখর হয়ে পড়লাম। ঐত আমার দোষ! যখন চুপ করে ভাল ছেলেটির মত এগুলো ভাল, আমি তখন বেশী কথা কইতে চাই।

আর যখন কথা বলবার সময় আসে তখন চুপ করে সবটুকু জানাতে চাই। কোথায় যে কথা বলার ও চুপ করে থাকবার সীমানা তা' আমার মনেই থাকে না।

প্রণাম করতে ভুলে গেলাম। হাত জোড় করে নমস্কার করতে করতে সিঁড়ি দিয়ে ঘাটে সতরঞ্চির উপর বসে পড়ে দেখি মাতাজীও হাত জোড় করে রয়েছেন। ভালও লাগল, আবার লজ্জিতও হোলাম। লজ্জার ভাব গোপন করে বল্লাম, "মাতাজী কাল অতো শীঘ্র ঠাণ্ডা লাগবার ভয়ে পালালাম, পথে কিন্তু বারবার মনে হোল, না জানি কত অপরাধ হয়ে থাকবে, কাল যদি আবার আসা হয়, এ রকম আর হতে দেব না। আজ পথে আসতে আসতে ভাবলাম, কাল যেমন আমি সব প্রথমে উঠে গিয়েছিলাম আজ আমি সবাইএর আগে গিয়ে উপস্থিত হ'ব। কিন্তু দেখছি আমার আগে এঁরা সবাই এসে উপস্থিত হয়েছেন।"

সকলেই মৃদু মৃদু হেসে উঠলেন। মাতাজী বল্লেন, "বাবা, মেয়ের কাছে বাবা আসবে, এতে সব আগে, সব শেষে, কি আছে? আচ্ছা বলত, কাকে তুমি সব আগে বা সব শেষে বলো? সব আগে সব শেষে বল্লে কি কিছু আছে? আবার আছেও বটে। কিন্তু সত্যিকার বল্‌তে গেলে যা সব আগে তাইত সব শেষে। আবার মধ্যেও তাই নয় কি?

আমি একটু অপরাধীর সুরে কথাটা নিজের তরফ থেকে ব্যক্তিগত করতে গিয়ে বল্লাম, "তা নয় মাতাজী, কাল আমি আগে থেকেই এসেছিলাম, তারপর এসেই যখন শুনলাম, আপনি মোটরে কোথাও গিয়েছেন তখন ভারি কষ্ট হোল। আমি এতদূর থেকে হাঁটতে হাঁটতে এলাম, আর মাতাজী কি না টপ্‌ করে মোটরে করে কোথায় চলে গেলেন! তা'ও পথ দিয়ে মোটর চলে গেল অথচ আমি তাঁকে দেখতেও পেলাম না!"

মাতাজী বল্লেন, "তোমাকে কিন্তু দেখা গিয়েছিল। আর তখনই বোঝা গিয়েছিল যে তুমি এখানেই আসছিলে।"

আমি একটু স্তম্ভিত হলাম। মোটরে চড়ে যাঁরা যান তাঁরা ত পথের হেঁটে চলা পথিকদের দেখ্‌তে পান না। মাতাজী আমাকে জানেন না, চেনেন না, তবে জানলেনই বা কেমন করে, চিনলেনই বা কেমন করে, আর দেখ্‌লেনই বা কেমন করে? আমি যখন মোটরে বসে যাই আমিও ত পথে হাঁটা মানুষদের দেখবার অবসর পাই না। একি হোল? তবে কি মাতাজী অমাদের চেয়ে পৃথক? ঐ যে আমার সামনে খোলা চুল, শাল গায়ে দিয়ে, হাসিমুখে ভদ্র মহিলা বসে আছেন, ওঁকে আমাদের থেকে পৃথক করতে আমার একটুও ইচ্ছা করল না। মাতাকে সন্তান যেমন আলাদা দেখ্‌তে পারে না, আমি ও তেমনই পারলাম না।

মাতাজী হাসিমুখে বল্লেন, "বাবা, পিতাপুত্রীর মধ্যে দূরত্ব কি আছে?

মনের মধ্যে দেখলাম, তাইত, মাতাজী পুত্রী হয়ে গেলেন, আমরা সবাই পিতার আসনে উঠে গেলাম। সত্যই ত, তিনি সংসারের পুত্রী, সারা সংসার তাঁর পিতা। সংসার বৃদ্ধত্বের দিকে অগ্রসর হয়ে মৃত্যুমুখে পড়ে। পুত্রী চিরকাল নবীনা থাকেন, অমৃতময়ী হয়ে থাকেন। আর সারা সংসার তাইত চায়। আমারও মনটা আশীর্ব্বাদে ভরে উঠ্‌ল। কিন্তু কে কা'কে আশীর্ব্বাদ করে? কাল যাঁকে বিশেষ করে প্রণাম করতে পেলাম না বলে পরে মনে অনুশোচনা হয়েছিল আজ তাঁকেই আশীর্ব্বাদি করতে পেলে বাঁচি, এমনই ভাবে মনে এল? এ যেন ঐ নদীর বুকে লহরের পর লহর যেমন উঠ্‌ছে আর পড়ছে তেমনই ভাবে। কিন্তু তারই ভিতর দিয়া নদীর প্রাণ এগুতে থাকছে। আমারও মনের

ওঠাপড়ার সত্ত্বেও আমার প্রাণটা এগুতে চাইল। দেখ্লাম শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক রাধাকুমুদ বাবু ওঠবার জন্য ব্যস্ত হল্লেন। মনে হোল, হয়ত আমার চপলতা ওঁর ভাল লাগছিল না। মনকে সংগ্রহ করে ভাবলাম, আচ্ছা, এবার চুপ করে থাকব, তাইত, অপর সবারও ত কথা কইবার আছে।

রাধাকুমুদ বাবু কাছে গিয়া ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া, আশীর্ব্বাদ ভিক্ষা করিয়া চলিয়া গেলেন। আর সকলের দৃষ্টি মাতাজীর উপর। আমি কেবল নদীর পানে চেয়ে বসে রইলাম। কিন্তু সবাই নীরব। এত চুপচাপ আমার ভাল লাগ্ল না। মাতাজীর মুখের দিকে চাইলাম। আমার চুপ করে থাকবার ইচ্ছা কোথায় লোপ পেয়ে গেল। তাঁর মুখের দিকে চেয়ে থাকবার লোভ সম্বরণ করতে পারলাম না! চেয়েও থাক্ব, অথচ কথাও ক'ব না। এত সংযম আমি কোথায় পাব? আমিই আরম্ভ করলাম, বল্লাম, "মাতাজী, আজ সকালে গীতা পড়তে পড়তে একটা শ্লোক, যা' পূর্ব্বেও অনেকবার পড়েছি, তার প্রতি দৃষ্টি পড়ল। শ্রীভগবান্ বলেছেন, "সর্ব্বধর্ম্মাণ্ পরিত্যজ্য মাম্ একম্ শরণম্ ব্রজ।" মাতাজী, শ্রীভগবান্ সর্ব্বধর্ম্মকে পরিত্যাগ করতে বলেছেন কেন? আমি ত জানি, অধর্ম্মকে ত্যাগ করে ভগবানের কাছে যাবার উপায় হয়, এখানে ধর্ম্মকে ত্যাগ করতে বলা হোল কেন? শুনুন শ্লোকটার এই অংশ বলি।" এই বলে বাঙলা অর্থ টুকুও নিজের কাছেই আওড়াতে লাগলাম, মাতাজীর মুখপানে চেয়ে।

মাতাজী আমার দিকে দৃষ্টিপাত করে আমারই মনের কথা বল্লেন, "বাবা, গ্রন্থ ত পড়া নেই। যেমন আসে, তেমনই বলা হয়। কেমন নয়?

এ তো আমারই মনের কথা। তবে মাতজীর মুখে শুনে আরও

ভাল লাগ্ল। যিনি উত্তর জানেন ও পেয়েছেন তাঁর মুখে এ'টা সহজ কথা। আমার মুখে সহজ নয়। কারণ আমি গ্রন্থ পড়ি। যখন কিছু বুঝি সেটা আমার নিজের গুণে বুঝি, আর যেটা বুঝতে পারি না সেটা গন্থের দোষ, আমার নয়। তাই গীতায় শ্রীকৃষ্ণ যা' বলেন, আমি বুঝতে পারলেই সেটা আর শ্রীকৃষ্ণের কথা নয়। সেটা আমার মনের কথা তিনি চুরি করে বলেছেন মাত্র। আর যেটা আমি বুঝতে পারছি না, সে সব কথা তিনি যে বলেছেন, তা'তে তাঁর কিছু ভাল হয় নাই, কারণ আমি যখন বুঝলাম না তখন নিশ্চয়ই সে কথায় গোল আছে। এইরূপ বুদ্ধিতে আমি কোথায় পড়ে আছি ও মাতাজী কোথায় রয়েছেন। তাই যে কথাটি আমার নিজের মুখে বলা উচিত ছিল তা তিনি আমার অন্তরে প্রকাশ করে দিলেন।

মাতাজী বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, ধর্ম্ম বল্তে কি বোঝায়? এই দেখ না, নদীর একটা ধর্ম্ম আছে, আছে ত? ঐ ফুল গাছের একটা ধর্ম্ম আছে ত, কেমন , বল? "

আমি সম্মতি জানালাম।

মাতাজী বল্লেন, "সেই রকম মানুষেরও ত ধর্ম্ম আছে, কেমন কি না? একটা ধর্ম্ম কেন? সে যে পরিবারের মানুষ, তার একটা ধর্ম্ম থাকতে পারে। আবার সমাজের একটা ধর্ম্ম থাক্‌তে পারে।"

আমি বল্লাম, "তা'ত থাকবেই, মতাজী, কথায় বলে কুল ধর্ম্ম, জাতি ধর্ম্ম, দেশাত্মক ধর্ম্ম, শাশ্বত ধর্ম্ম, ইত্যাদি।"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, তবেই বল, তারপর হিন্দু, মসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি আবার সাম্প্রাদায়িক ধর্ম্ম রয়েছে। কেমন নয়? এখন মানুষ কোন্‌টা ছেড়ে কোন্‌টা রাখ্‌বে বল?"

একটু থেমে বল্লেন, "তাই এখানে বলা হয়েছে, শরণাগত হবার কথা। শরণ লওয়া কাকে বলে? যখন মানুষ আর তাঁকে ভিন্ন জানে না, কেমন ত? তাঁর শরণ নিতে হলে কি দরকার? আমি যা

ধরে আছি সব ত আমাকে ছাড়তে হবে? তবেই ত তিনি আমাকে ধরতে পারবেন? তারপর যেই জানব, তিনিই ধরে আছেন, তখন ত সব ধরা ঠিক হয়ে যাবে। কারণ তিনিই ত সব। সব ছাড়া কি, বাবা, তিনি আছেন? তুমিই বল, এই সবই ত তিনি?" এই বলে আকাশ থেকে নদীগর্ভ পর্য্যন্ত হাত বাড়িয়ে দেখালেন।

"দেখ বাবা, আর একটি কথা। এখানে বলা হয়েছে একম্। অর্থাৎ এককে। ভিন্ন ভিন্নকে নয়। সেই এক কোথায়? তিনিই ত এই সকলের অন্তর জুড়ে রয়েছেন।"

আমি আমার অন্তর খুঁজে আবার চক্ষু মেলে মাতাজীর দিকে দেখতে লাগলাম।

মাতাজী স্থির দৃষ্টিতে আমার দিকে চেয়ে বল্লেন," কেমন বাবা, হোল ত?"

যেটুকু অর্থ কথায় ছিল না তা' তাঁর দৃষ্টিতে সম্পূর্ণ হোল। আমিও ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালাম।

"মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, প্রশ্ন তিনিই দেন, আর উত্তরও তাঁর কাছ থেকেই আসে।"

আমি ভাবলাম, তবে কি মাতাজী নিজেকে সরিয়ে নিতে চেষ্টা করছেন? না তাঁর স্বরূপ আমার কাছে আরও প্রসার লাভ করছে? কিন্তু সামনে মাতাজীকে রেখে ভাববার সময় নাই। আমি বল্লাম,"মাতাজী, সকালে যিনি মনের মধ্যে প্রশ্ন দিয়েছিলেন, আশা করে বসেছিলাম, সূর্য্য অস্ত যাবার আগেই তিনিই যদি দয়া করে উত্তর দেন। তাতো হয়ে গেল। এখন বলুন দেখি, এসব গ্রন্থ ট্রন্থ পড়া ভাল কি?"

মাতাজী উৎসাহের সঙ্গে বল্লেন, "হাঁ খুব ভাল। সব ভাল গ্রন্থ পড়বে। ভাল কি জান? যা তাঁর কথা মনে করিয়ে দেয়। তাঁর কথা

বলবে, তাঁর কথা ভাববে তাঁর কথাই শোনবার চেষ্টা করবে। তিনিময় হয়ে থাকবে, বাবা। তিনি তুমি কি আলাদা, বাবা? তুমি তাঁর, তিনি তোমার এও যেমন কথা, আবার তুমি তিনি ও তিনি তুমি এ'ও ঠিক সেই একই কথা।"

রূপ কথার গল্পের মত সোনার কাঠী কে যেন আমার অন্তরে বুলিয়ে গেল। তার হাতখানি দেখতে পেলাম না। কিন্তু সমস্ত অন্তর উন্মত্ত হয়ে, মাতাল হয়ে উঠল। আবার শিশুর মত চেয়ে থাকতে ইচ্ছা করল, যদি আবার পরশ পাই।

আমি বল্লাম, "মাতাজী, এ কিন্তু বড় কষ্ট। যত পড়ব, ততই মনে প্রশ্ন উঠবে, একটার পর আর একটা। এর তো শেষ নাই। তারপর উত্তরের জন্য বসে থাকতে হবে। আজ যেমন প্রশ্ন উঠল, আজই উত্তর এল, এমন ত আর রোজ হবে না? তবে বলুন দেখি, এ কি রকম দগ্ধানি?"

মাতাজী হেসে বল্লেন, "হাঁ বাবা, এ দগ্ধানি ভাল। আর সবের চেয়ে ভাল নয় কি? তুমিই বল, ভাল লাগে না কি?"

একটু থেমে বল্লেন, "অন্তরে যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাস থাকে, তারপর যা' হ'বার হউক্ না। তা'তে কি আসে যায়। দেখ বাবা, তুমি পড়বে, খুব পড়বে। তবে একটা কথা মনে রাখবে, নির্জ্জনে ভাবাও চাই। ঐ দেখ না, চাষীরা যখন বীচি পোঁতে, কত ভিন্ন ভিন্ন নিয়ম। কত দিন ফেলে রাখে, রৌদ্রে দেয়, তারপর যখন পোঁতে, কখনও মাটির উপর ভাগেই, আবার কখনও বা গর্ত্ত করে। আবার কি আশ্চর্য্য দেখ, যখন গাছ হয়, কেউবা একবার ফসল দিয়ে শেষ হয়ে যায় যেমন ধান গাছ, আবার কেউবা বড় গাছ হয়ে অনেক বৎসর ধরে ফল দেয়। এই জন্যে বোঝা যায় না কি, যে সবাইএর জন্য এক রকম নিয়ম হতে পারে না?"

আবার বল্‌তে লাগলেন, "কিন্তু সব সময়েই মনে রাখবে বাবা, তোমার জীবন কিছু একটা আলাদা নয়। এ, যা দেখ্‌তে পাচ্ছ, আর পাচ্ছ না, যা তোমার কাছে প্রকাশিত হচ্ছে ও প্রকাশ পাচ্ছে না এ সমস্তই তোমার জীবন। তোমার শত্রু যে সেও তোমার বলেই তো শত্রু?

মাতাজী হাসলেন। যীশুর কথা "Love your enemy" আমার অন্তরে বেজে উঠ্‌ল ও এই মহাবাক্যের একটা নূতন অর্থ চোখের সামনে ভেসে উঠ্‌ল কী আশ্চর্য্য। মাতাজী কি মনের কথা বুঝেছিলেন? তিনি বল্লেন, "দেখ বাবা, গির্জ্জায় যাবে, মন্দিরে যাবে, যেখানে তাঁকে পাবে যাবে, সব তোমার, সব তুমি। কেমন, বল, নয় কি?"

আমি বল্লাম, "গোড়ার কথা আপনি যা বলেছেন আমি ত তার সম্বন্ধে ভেবে এখনও কূল কিনারা পাচ্ছি না। যদি শ্রদ্ধা, বিশ্বাস থাকে এই কথাই ত বল্লেন? আমার শ্রদ্ধা হোল কি না সে তো ভগবান্‌ নিশ্চয়ই বোঝেন। কিন্তু আমি কি করে বুঝবো যে আমার শ্রদ্ধা বিশ্বাস হলো? কথাটা নিজের দিক্‌ থেকেই বুঝতে চেষ্টা করছি।"

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, ক্রমশঃ নিজেই বুঝতে পারবে। একেবারেই সমস্ত কথা বোঝা যায় না। তবে প্রথম প্রথম দেখা যায় যত বেশী ভাল লাগে, যত খানিক আনন্দ হয়, তা পাবার জন্যে, তার চেয়েও বেশী পাবার জন্যে, ইচ্ছা করে। তখনই জানবে শ্রদ্ধা বিশ্বাস ঠিক হয়েছে। আর যতক্ষণ না এমনটি হবে, ততক্ষণ কি চুপ করে বসে থাকতে পারবে?"

মাতাজী বলতে লাগলেন, "কিন্তু একথা ভুলো না বাবা, তিনিই দে'ন, তিনিই পান; দেওয়া পাওয়া কী আছে তখন তাও আর জানবার থাকে না।" মাতাজী চক্ষু অন্য দিকে ফিরিয়ে নিলেন।

তাইত! আমি একাই কথা বলে যাচ্ছি। ভিড়ের মধ্যে আরও কতজন হয়ত কথা বলবার জন্য উৎসুক হয়ে আছেন! মাতাজী নিজেই আরম্ভ করলেন, "তবে পড়াশুনার সঙ্গে ক্রিয়াও চাই। ক্রিয়া কী জান?—স্তব, স্তুতি, জপ, নির্জ্জনে চিন্তা করা।"

আরও কী যেন বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু কথা শেষ করতে পারলেন না। একজন স্বামিজী এসে জানালেন যে কলিকাতা হইতে একটি ভদ্রলোক এসে পৌঁছেছেন ও তাঁর কি যেন প্রাইভেট জরুরী কথা বলবার আছে। তখন আমরা ব্যস্ত হয়ে পড়লাম, মাতাজী উঠে যাবেন কি আমরা সকলে উঠে যাব? সকলেই এক বাক্যে সাব্যস্ত করলেন যে আমরা উঠে গিয়ে কালকের সেই শামিয়ানায় অপেক্ষা করব। মাতাজী সম্মতি দিয়ে বসে রইলেন।

আমি উঠে গিয়ে স্বামিজীকে ধরলাম। বল্লাম, "চলুন আমরা কথাবার্ত্তা কই।"

স্বামিজী বল্লেন, "সে কি কথা, মা'র পর আমি কী বল্‌ব?

আমি বল্লাম, "আমিই না হয় আপনাকে বল্‌ব আর আপনি শুনবেন। চলুন ত?"

স্বামিজী খুব হেসে বল্লেন, "সে বেশ কথা।" তারপর আমরা শামিয়ানায় গিয়ে একটি নির্জ্জন প্রান্তে বসে, দু'টি অনেকদিনের পরিচিত ভাইএর মত, কত কথাই কইলাম। নদীর কূলে, আকাশের গায়ে, সে সব কথা প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল কি না, কে জানে? আমার কিন্তু বেশ ভাল লাগছিল। সে সব আধ্যাত্মিক কথা নহে। মাতাজী কাশীতে, গঙ্গা বক্ষে, নৌকায় কতদিন ছিলেন, মৈনপুরী কেমন লাগল, লক্ষ্ণৌএ এখন কতদিন থাকবেন, তারপর কোথায় যাবেন, তাঁর রোজ নামচা রাখা হয় কি না, তাঁর পক্ষ থেকে কোন মাসিক পত্র বাহির হয় কি না

ইত্যাদি প্রশ্নের উত্তরে যাহা জানলাম তা'তে মনে হোল মাতাজী এসব সম্বন্ধে একেবারে উদাসীন। কোন কিছুরই চেষ্টা তাঁর নাই। কাল কোথায় থাকবেন তা' ঠিক করা থাকে না, উনি নিজেও বলেন না। হিন্দুস্থানী বড় ঘরের মেয়েরা এসে জমা হতে লাগলেন। সকলেই দেখ্‌লাম, ভারে ভারে ফল মিষ্টান্ন প্রভৃতি উপঢৌকন নিয়ে আসছেন। দৃশ্যটি বড় ভাল লাগল।

শামিয়ানায় লোক ধরে না। এত বেশী লোক আসছে দেখে আমি একটু ব্যস্ত হলাম। স্বামিজী কী কাজে অন্যত্র গেলেন। আমিও একবার উঠে দেখ্‌লাম মাতাজী সেই দিকে আসছেন। আমি মাঝপথে দাঁড়িয়ে পড়লাম। মাতাজী বল্লেন, "কি বাবা, এখনই চল্লে?" এমনই সরল ভাবে বল্লেন যে আমার উদ্বিগ্ন মন সরল হয়ে উঠ্‌ল। আমি বল্লাম, "না মা, আজ গায়ের কাপড় এনেছি। আজ খানিকক্ষণ বস্‌ব। তবে দেখুন, আমার মা আপনার কাছে আসতে চেয়েছেন, কাল সকালের দিকে আপনার কাছে আন্‌ব।

মাতাজী ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানালেন।

শামিয়ানায় গিয়ে মহিলাদের কাছটিতে মাতজী বসলেন। একটু তফাতে পুরুষরা সব বসলেন। আমি পুরুষ ও মেয়েদের মাঝামাঝি, সব পেছনে বসলাম। তবে ঠিক আমার সম্মুখেই আর এক প্রান্তে বিশিষ্ট আসনে সমতল ভূমিতে সকলের সঙ্গে আসীনা মাতাজী সকলের দৃষ্টির কেন্দ্র হয়ে রইলেন। যোশীজী আলো জ্বেলে উচ্চৈঃস্বরে প্রণাম জানিয়ে, তাঁর পরিচিত কয়েক জন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির পরিচয় চীৎকার করে মাতাজীকে জানাতে লাগলেন। এ সব কথা বলা বাহুল্য। কারণ আমার মনের মধ্যে মাতাজীর কথাগুলিই বেশী করে বাজছিল, আর সব ভাল লাগছিল কিন্তু মনের মধ্যে ঠাঁই পাচ্ছিল না। লোকেদের আসা যাওয়া, মেয়েদের পরস্পরের মধ্যে গুঞ্জনধ্বনি, দু'একজন মাতাজীর অনুগত ব্যক্তির মাঝে মাঝে নানা বিষয়ে আদেশ চাওয়া কিছুই আমার অন্তরে প্রবেশ করছিল না। আমার মনের দরজা কতকটা খোলা ছিল বটে, কিন্তু নিভৃতে আমি তখনও বোধ হয় আমার মনের ভিতরকার মাতাজীর সহিত কথা কইছি কিংবা আরও শোনবার চেষ্টা করছি।

হঠাৎ দেখ্‌লাম, সবই চুপচাপ। সন্ধ্যা নেমে আসছে। মাতাজীর মাথা দুলচে। জগতের খবর আমি তখন জানি না। মাতাজীর চোখদুটি কি একটুখানিক বুজে গেল? কিংবা হয়ত আমার দেখ্‌তে ভুল হোল। জগতের মাতা যিনি তিনিও কি সন্ধ্যার আগমনে একটুখানিক চক্ষু মুদ্রিত করে নিলেন? মাতা শিশুকে ঘুম পাড়াবার পুর্ব্বে কি নিজেও একটুখানিক ঘুমিয়ে পড়েন? আমার চোখে কিন্তু ঘুম আসে নাই। মাতাজীও চক্ষু মেলিলেন। সবাই চুপচাপ দেখে আমাকেই আরম্ভ করতে হোল। আমি বল্লাম, "মাতাজী, আচ্ছা, ধর্ম্মজীবনের জন্য ঘুমটা ভাল কি? অবশ্য আমি কিছু না ভেবেই আপনাকে জিজ্ঞাসা করছি।"

মাতাজী বল্লেন, "তা বেশ করেছ বাবা। দেখ বাবা, ঘুম সবইএর পক্ষে সমান ত হয় না, শিশুরা কত বেশী ঘুমায়, তারপর বয়স হতে হতে ঘুম যায় ও বৃদ্ধদের অনেকের দেখ্‌তে পাওয়া যায় ঘুম হতেই চায় না, ঘুমের জন্য সাধনা করতে হয়। যার যেমন দরকার তার তেমনই ঘুম হওয়া চাই ত?"

আমি সম্মতি জানিয়ে বল্লাম, " কিন্তু ধর্ম্ম সাধনকালে ঘুমের প্রয়োজন নাই বলে ধরব কি?"

মাতাজী বল্লেন, "তা ধরবে কেন বাবা? এইত বলা হোল সব লোকের কথা ত একরকম হতে পারে না। পারে কি?"

আমি বল্লাম, "মাতাজী ঘুমের মধ্যে যে সুষুপ্তি আছে তা কি কল্যাণপ্রদ?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ সে ত বেশ অবস্থা। কিন্তু জেগে থাকা আরও ভালও অবস্থা নহে কি?"

আমি বল্লাম, "জাগ্রত অবস্থায়ও সুষুপ্তি হয় ত?"

মাতাজী বল্লেনম, "হয় বৈকি, দেখ বাবা, জাগ্রত-সুষুপ্তি ঘুমন্ত অবস্থার সুষুপ্তির চেয়ে অনেক ভাল।"

কথাটা কেহ কেহ আবার শুনতে চাওয়ায় মাতাজী আবার বল্লেন। তারপর বল্লেন, "এইত আসছে বাবা যে জাগ্রত সুষুপ্তির কাছে ঘুমানো সুষুপ্তির মূল্য অর্দ্ধেক। তা'হলে জেগে থেকে সুষুপ্তিতে থাকাই বেশী ভাল নহে কি?"

কাছে যাঁরা বসেছিলেন তাঁদের মধ্যে একটি ভদ্র মহিলা অস্ফুটস্বরে বল্লেন, "আপনি ত স্বপ্নের কথা কিছু বল্লেন না। আমার কিন্তু স্বপ্ন বড় ভাল লাগে। আমি স্বপ্নে প্রায়ই কালী ঠাকুর, শিব ঠাকুর, সব দেখি। খুব ভাল লাগে। কিন্তু এ'ও দেখেছি যে রাত্রে শোবার সময় কিছু না ভেবে শুই সে রাত্র তো দেখ্‌তে পাইনা।"

মাতাজী বল্লেন, "তুমি ঠাকুর দেবতাদের স্বপ্নে দেখ্‌তে পাও? সে ত খুব ভাল কথা। অন্য কিছু দেখবার চেয়ে ঠাকুর দেবতা দেখলে বেশী আনন্দ হয় না?" তারপর সমস্ত তাঁবুটা নিরীক্ষণ করে, একটা যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, সমস্ত ব্যাপারটা যেন আমাদের বুদ্ধির গোচরে আনবার জন্য বল্লেন, "কিন্তু স্বপ্ন ত স্বপ্নই বটে। স্বপ্ন তো ভেঙ্গে যায়, ভেঙ্গে যায় না কি? তারপর এই যে সবটা, এও ত একটা স্বপ্ন। এও ত ভেঙ্গে যাবে?"

কথাটা শুনেই আমার চমক লাগল, আমি বল্লাম, "মাতাজী, তবে কিএক সময় জেগে উঠে দেখ্‌ব, আর এক যায়গায় জেগে উঠলাম, আর এ সমস্ত বৈচিত্র স্বপ্নের মত মিলিয়ে যাবে।"

মাতাজী বল্লেন, "বাবা, সেতো হবেই। এ স্বপ্ন ত একদিন ভাঙ্গবেই। এর চেয়ে বড় একটা বৈচিত্রের মধ্যে ঘুম ভাঙ্গবে। আচ্ছা তুমিই বল, এ জীবনেই কি ঠিক এমনতর হয় না?"

মাতাজী আবার আমাকে কোথা থেকে টেনে এনে সেই তাঁবুতে তাঁর কোলের কাছটিতে বসালেন। হঠাৎ ভূত দেখ্‌লে শিশু যেমন মায়ের বুকের মধ্যে আরও কাছে গিয়ে জুড়াতে চায় আমিও সেই মত অদৃশ্যময়ী মাতাজীকে বুকের মধ্যে রেখে সামনে প্রতিমূর্ত্তির দিকে অপলক দৃষ্টিতে দেখ্‌তে দেখ্‌তে দিশেহারা হয়ে গিয়ে আবার আত্মহারা হয়ে গেলাম।

সবাই কিন্তু চুপচাপ। আমার বড় ঈর্ষা বোধ হোল। এরা সবাই নিশ্চয়ই আমার চেয়ে আরও অনেক কাছে, মাতাজীর কাছে, পৌছে গেছে। তাই কথা নাই। আর আমার ও মাতাজীর মধ্যে কথার ঢেউ বয়ে যাচ্ছে। যেন ওপারে একজন আর এপারে আর একজন। তবু চুপ করে থাকতে পারলামনা। বল্লাম, "মাতাজী, তখন আপনি যে ক্রিয়ার কথা বলছিলেন, তাতো শেষ হতে পেল না। ক্রিয়া কি রকম করা চাই, আর একটু বলুন।"

বলতে ভুলে গিয়েছি সভায় বেশীর ভাগ হিন্দুস্থানী পুরুষ ও রমণী উপস্থিত থাকায় মাতাজীর অনুরক্ত কয়েজন ভক্ত বলেছিলেন, "হিন্দীতেই কথাবার্ত্তা হউক্।" সেই জন্য মাতাজী প্রায় সব সময়েই উত্তর হিন্দীতেই দিচ্ছিলেন। ভাঙ্গাচোরা ভাবাঠিক জোড়া লাগছে না এই রকম একটা অনুমান করে মাতাজী একবার বল্লেন, "কি করি বাবা, এ শরীরে টুটা ফুটা হিন্দী আসে যেমন পাখীরা উচ্চারণ করে।" সকলেই বলে উঠ্‌লেন, "না মাতাজী, আমাদের বেশ ভাল লাগছে।"

ভিড় ক্রমশঃ বাড়তে লাগল। শামিয়ানা জোড়া দিয়া অনেকখানি স্থান করা হয়েছিল। এক্ষণে লোকেরা পশ্চাতে দাঁড়িয়ে যেতে লাগলেন ও মাতাজীকে দর্শন করবার জন্য অনেকে পিছনে থেকে সাগ্রহে ইতঃস্ততঃ দৃষ্টি নিক্ষেপ করে অনেক কষ্টে মাতাজীর মুখখানি কতক দেখ্‌তে পাচ্ছিলেন। সেই কারণই বোধ করি প্রস্তাব উঠ্‌ল যে মাতাজী একটু উচ্চে একটা কৌচে বস্‌লে ভাল হয়। একখানি সোফা চারজন মিলে যথাক্রমে বয়ে আনলেন। মাতাজী চুপ করে দেখছিলেন। কিন্তু তাঁকে ব্যবস্থাটা জানাতেই তিনি এমন নীরবে "না" করে দিলেন যে সকল যুক্তি তর্ক পরাস্ত স্বীকার করল। মাতাজী সকলের সঙ্গে সমতলভুমিতে বসে রইলেন, তাঁকে একটুও বিচলিত করতে কেহই পারল না। অথচ কারও মনে কষ্টও হোল না। পিছনে যাঁরা ছিলেন তাঁরা যেন মাতাজীর প্রকৃত স্বরূপ আরও বেশী করে দেখ্‌তে পেলেন। ও সেই জন্যই বোধ করি বলে উঠ্‌লেন, "না, মাতাজী, আপনি যেখানে বসে আছেন, ঐখানেই থাকুন, আমরা বেশ দেখতে পাচ্ছি।"

মাতাজী কিন্তু একটুখানিক উদ্বিগ্ন হয়ে যাঁরা দাঁড়িয়ে আছেন তাঁদের জন্য যাহাতে বসবার স্থান হয় তাই তাঁহার কাছে যে সব মহিলারা বসে ছিলেন তাঁদের মধ্যে নিকটতম এক বৃদ্ধাকে হাত দিয়ে জাপটে ধরে বল্লেন, "মা, তুমি, তোমরা সবাই, মেয়ের কাছে, আরও কাছে, সরে এসে বসো না!" বৃদ্ধা, মাতাজীর আসনের খানিকটা অংশে পৌঁছে গেলেন ও মাতাজী সতরঞ্চির দিকে নেমে যাচ্ছিলেন। কেহ কেহ বলে উঠ্‌লেন, "মাতাজীর আসনে কিন্তু মাতাজীর বসা চাই।" বৃদ্ধা সম্ভ্রমে সে অনুযোগ স্বীকার করে নিলেন। মাতাজী বল্লেন, "বাবা, মেয়ের আবার মায়ের কাছে আলাদা হওয়া কি? উঁচু নীচু স্থান কি? সবাই এত

যখন কাছাকাছি মিলে মিশে থাকা তখন সেই ভাবটা বেশী করে মনে রাখ্‌লে ভাল হয় না কি?"

আমি কথাটাকে ফেরাবার জন্য বল্লাম, "মাতাজী, আপনি ক্রিয়ার কথা বলছিলেন। আর কি বল্‌বেন না?"

আবার মাতাজী আরম্ভ করলেন। যাহা বলছিলেন তাই আবার কতকটা পুনরাবৃত্তি করে বলতে লাগলেন, "দেখ বাবা, মন্ত্র, জপ, তপ, পূজা, অধ্যয়ন, সবই ভাল। সবই দরকার। যার যতটা উপকারে লাগে। তবে দেখ, প্রথমে এ সব ভিন্ন ভিন্ন বলে মনে হয়। ক্রমশঃ দেখা যায় সবই এক রকম হয়ে যায়। স্কুলে যখন ছেলে ভর্ত্তি হয়, কতগুলো বিষয় পড়ে। ক্রমশঃ বিষয়গুলো বেড়ে গিয়ে কমে যায়, আবার বদলেও যায়। পরে কেউ বা ইঞ্জিনিয়ার হয়, কেউ বা প্রফেসার হয়, কিন্তু আবার সেই একটা বিষয় ধরেই অন্য কত বিষয়ের মধ্যে প্রবেশ করে। এ কের মধ্যে নানা পথ হয়ে যায় যেমন নানা থেকে একটি পথের সন্ধান পাওয়া যায়। তেমনই ধর্ম্ম সাধনার মধ্যেও নানা পথের উদয় হয়, আবার সব মিলে যায়। জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম, কোনটাই, বাবা, পৃথক নয়। ভক্তি না থাকলে জ্ঞান হয় না, জ্ঞান না থাকলে কর্ম্ম করা যায় না। আবার কর্ম্ম জ্ঞানকে শুদ্ধতর করে, ভক্তিও তো সঙ্গ ছাড়ে না। কখন যে কোন্‌টা নজরে থাকে, আর কোন্‌টা থাকে না, সে কথা সাধক নিজেই ভুলে যা'ন। তবে এ নিয়ে তো গোল করা ঠিক নয়। ঠিক কি? তাই হয় বাবা, কোন পথ, কোন ক্রিয়াই ফেলবার নয়। যেটা তোমার অনুকুল মনে হয়, সেইটা ধরেই চল, বাকিগুলো কেউই প্রতিকূল হবেনা। তুমি কেন প্রতিকূল হবে বাবা? সব দিয়ে সেই সবকে, সব যিনি, তিনিই ত ধরে রয়েছেন। যদি ছাড়েন বলো, সেও ত তাঁর ধরাই। তাঁর কাছে ছাড়া আর ধরা, কি আছে বল দেখি?"

একটু চুপ থেকে আমি বল্লাম, "মাতাজী, আপনি স্কুলের উদাহরণ দিলেন। স্কুলে যখন যাই, বাবা নিয়ে গিয়ে ভর্ত্তি করে দে'ন, মাষ্টার মশায় পথ বলে দে'ন। সাধনার পথেও কি তা'হলে গুরু না হলে চলবে না?" মাতাজী বল্লেন, "তা'ত সত্যি, বাবা, গুরু চাই বৈ কি। সামান্য লেখাপড়ার জন্য গুরু যখন দরকার হয়, ধর্ম্ম সাধনায় গুরু দরকার হবে না?"

আমি বল্লাম, "মাতাজী তা'ত বুঝলাম। তবে গুরু পাওয়া কি করে যাবে? পৃথিবীর স্কুল কলেজের ছাত্রেরা তা গুরুর অন্বেষণ করে নেয়, আবার ভুলও করে। যাক্ সে কথা। ধর্ম্ম-জীবনেও কি ঐ একই পথ? শিষ্যকে কি গুরু-অন্বেষণ করতে হবে? না, গুরু যিনি তিনি শিষ্যকে খুঁজে নেবেন?"

কথাটা হয়ত আমার বলা উচিত ছিল না। কিন্তু আমি ত কোন বিশেষ ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয়ে বলিনি। জানতে চেয়েছিলাম, সাধন জীবনের নিয়মটি কী? মাতাজীও রুষ্ট হলেন না। আনন্দময়ী মা যদি রুষ্ট হ'ন তা'হলে তাঁর নামের সার্থকতা কোথায়?

মাতাজী বল্লেন, "দেখ বাবা, ঐ দুরকমই হয় অথবা এও বলা যায় যে দু'জনা দুজনকেই খোঁজেন। কারণ আসলে সেই একজনই একজনকে পান কি না। পান না কি? তবে কথা হচ্ছে দু'জনের ভিতরেই সেই এক ইচ্ছাই কাজ করে, সেই একই ইচ্ছা সব ঘটাচ্ছে বাবা। তুমিই বল?

আমি নিজের অন্তরে খুঁজতে চেষ্টা করলাম। কথা ত অনেক কইলাম। মাতাজীর উত্তরগুলি প্রাণের উপর পরশ বুলিয়ে গেল। যেটুকু জ্ঞান পাওয়া গেল সেটুকু পৃথক করে নিবেদন করে আলগোচে জানাব,

এমন উপায় নাই। মাতাজীর উত্তরগুলি তাঁর জীবনের এত ঘনিষ্টভাগ বলে মনে হতে লাগ্‌ল যে তাঁকে ও তাঁর কথাগুলিকে অভিন্ন বলে মনে হতে লাগল। আর একটা জিনিষ লক্ষ্য করলাম , তিনি যা' উত্তর দে'ন, তার ভাষা এত সরল, ভাব এত সুস্পষ্ট, যে তা' শুনতে বা বুঝতে কষ্ট হয় না। আর বলবার ভঙ্গিতে যেন সমস্ত উত্তরের অধিষ্ঠাত্রী দেবী রয়েছেন। সেই ভঙ্গিটুকু মর্ম্ম স্পর্শ করে বুঝিয়ে দেয় যা' কথায় অব্যক্ত থেকে যায়। তাঁর সব কথা শুনে মন সায় দিয়ে ওঠে যে বুঝেছি। কিন্তু কেহ যদি জিজ্ঞাসা করেন, কি বুঝেছ? তার উত্তরে নিরুত্তর থাকা ছাড়া উপায় নাই। যেমন পেট ভরেছে কি না, তার উত্তরে বলা যায় "হাঁ ভরেছে।" কিন্তু কি খেয়ে ভরেছে, তার আস্বাদ কেমন লাগল তা' যে খায় নাই তাহাকে বোঝান যায় না। আর যে খেয়েছে তাকে বোঝাবার দরকার হয় না।

রাত্রির গাঢ় অন্ধকারের মধ্যে নদীর স্বল্প কায়াটুকু ছায়াপথের ভিতর দিয়া দৃষ্টিগোচর হচ্ছিল। পথ চলে গেছে। তার শেষ কোথায় তা' পথই বলে দিতে পারে। মাতাজী কি ক্লান্ত বোধ করেন না? শুনেছি সকাল থেকে লোকের ভিড় থাকে। সবাই কত কথা জিজ্ঞাসা করে। সত্যি, এবার আমার চুপ করা উচিত। কিন্তু চুপ করে বসে থাকা আমার পক্ষে অসম্ভব ছিল। এত কাছে বসে চুপ করে থাকব কেমন করে? মনে মনে স্থির করলাম মাতাজীর কাছে আজ আমার বিদায় লওয়াই ভাল। দূর থেকেই একটা যেমন করে হউক্ প্রণাম জানালাম। মাতাজী বল্লেন, "ঠাণ্ডা লাগবে বাবা? এইবার যাবে বুঝি?"

আমি বল্লাম, "হাঁ মাতাজী, কাল আবার দেখা হবে।"

মাতাজী উত্তর দিলেন না। কান পেতে রইলাম। তিনি আদেশ দিলেন, "এইবার কীর্ত্তন হউক্।"

কীর্ত্তনের ব্যবস্থা বোধ করি পূর্ব্বে থেকেই ছিল। তৎক্ষণাৎ আরম্ভ হতেই চলে আসা আমার ভাল লাগ্‌ল না। শামিয়ানা থেকে উঠে দাঁড়িয়ে রইলাম, খানিকক্ষণ শুনতে লাগলাম। মাতাজীর আর যেন স্পর্শ পাওয়া আমার পক্ষে কঠিন হয়ে গেল। সাবাই গাইছেন "রঘুপতি রাঘব রাজা রাম, পতিতপাবন সীতারাম।" আর মাতাজীর স্বরূপটি কোন উদ্দেশবিহীন অসীমের পারাবারে মগ্ন হয়ে পড়ছে তা' সেই স্তিমিত আলোকে ক্ষীণ দৃষ্টিতে আমার অনুভূতির বাহিরে ছিল না। আমি বুঝলাম, মাতাজী ডুবে গেছেন। আমি কিন্তু তাঁর সঙ্গে যেতে পারলাম না। কীর্ত্তনের কথাগুলো আমার শরীরকে যেন কাঁটার মত বিদ্ধ করতে লাগল। অযোধ্যা প্রদেশের পুণ্যভূমিতে রাজা রামের কীর্ত্তনের মধ্যে রাজরাজেশ্বরীকে ডুবতে দেখে আমি অন্ধকার পথে পা বাড়ালাম।

আকাশের চাঁদ আকাশে, নদীর জল নদীতে। আমার মন সুরের সঙ্গে ভেসে ভেসে একটি স্বরূপের অন্বেষণে উদাস হয়ে চলে গেল। ঘরে ফিরলাম বটে, কিন্তু মন আর ফিরল না।

(৩)

মাতাজীর দরবারে সকালবেলা

পরের দিন (৪ঠা ফেব্রুয়ারী) সাকাল বেলা। বেলা প্রায় দশটা হবে। আমার মাতা ঠাকুরাণীর প্রস্তুতির বিলম্ব হওয়ায় তাঁকে নিয়ে মাতাজীর কাছে পৌছাতে দেরী হয়ে গেল। মাতাজীর নিকট পৌঁছে দেখ্‌লাম, অনেকগুলি ভদ্রমহিলা তাঁকে ঘিরিয়া বসিয়া আছেন। হাসিমুখে অভিবাদন করলেন। কি যেন কথাবার্ত্তা হচ্ছিল। আমি আমার অন্তরে

আবহাওয়ার মাপকাঠির স্পর্শ নিতে ব্যস্ত ছিলাম। মনে হোল মাতাজী যেন অন্তঃপুরে বসে আছেন। সে যে কোথাকার অন্তঃপুর তাই খুঁজতে লাগলাম। মহিলাদিগের মধ্যে বাঙালী, হিন্দুস্থানী, পাঞ্জাবী, কাশ্মীরী সব রকমই ছিলেন। মাতাজীকে বাঙলা কিংবা হিন্দীতে প্রশ্ন করা হচ্ছিল। তিনি হিন্দীতে কখনও বাঙলাতে উত্তর দিচ্ছিলেন। বাঙলায় বলে আবার হিন্দীতে তার পুনরুক্তি করছিলেন। সেই হেতু সকলেই বুঝতে পারছিলেন। আমার মত কয়েকটি পুরুষও যাঁরা এসে পড়েছিলেন পিছনে ছিলেন।

অন্তঃপুরীকাগণের চিন্তার একটা বিশেষ ধারা লক্ষ্য করলাম। প্রায় সকলেই মৃত্যু সম্বন্ধে জানতে চা'ন। মৃত্যু ও মৃত্যুর পরে জন্ম হয় কি না ইত্যাদি। একজন বলিলেন, "মা, মৃত্যুর পরে মানুষ থাকে কি?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, থাকে বৈকি। এই যেমন গাছ থেকে বীজ, আবার বীজ থেকে গাছ হয়। সেই রকমই মানুষ মরলে পরে বীজের মত জন্ম মৃত্যু এইভাবে চলতে থাকে।"

আর একজন জিজ্ঞাসা করলেন, "আচ্ছা, মৃত্যুর পরেই কি জন্ম হয়? সময় লাগে না?

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, সময় লাগে, আবার লাগেও না। এই যেমন তোমরা এসেছো, আবার বাড়ী যাবে। পথে কোথাও দাঁড়িয়ে যেতে পারো, আবার সোজা চলেও যেতে পারো।"

একটি যুবক পিছন থেকে বল্লেন, "আত্মা ত একটাই। তবে এতজনের আলাদা অবস্থা হয় কেমন করে?"

মাতাজী বল্লেন, "হাঁ, আত্মা এক বটে। কিন্তু জল যেমন ভিন্ন ভিন্ন